ভারতে মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণা ঃ ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস

সব্যসাচী সরকার

প্রাচীন কালে মানুষের ভাবনা চিন্তা মানবীয় আচারসংহিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমস্ত সৃষ্টির নির্ণায়ক ঈশ্বর এবং তাঁর জন্য প্রার্থনা, ভগবান প্রদত্ত মানুষদের কর্তব্যের সূচীগুলির পালন, ইতিহাস ও এদ্বারা স্বজাত রাজনীতি জাতীয় বিষয়গুলিই প্রাধান্য পেয়ে আসত। এ বিষয়ে পৃথিবীতে যেকোন মানব সভ্যতার প্রাথমিক ইতিহাস প্রায় একই প্রকার। এইসব ভাবনা চিন্তার মধ্য দিয়েই সাধারণ দর্শনে পঞ্চতন্ত্রের ব্যাখ্যায় যেমন earth, air, fire, water, energy জাতীয় বিষয়গুলিকে দেবতা ভিত্তিক করে তাঁদের দ্বন্দ্বগুলির চিত্রণই বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত। প্রাচীন ভারত ও বৈদিক যুগের বেদচর্চারই অঙ্গ হিসাবে অথর্ব বেদ এবং তা বিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তা গুলিরই প্রতিফলন। কিন্তু বৈদিক যুগের এই বিজ্ঞান সাধনা বেদের মত গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গুরুশিষ্য পরম্পরায় মন্ত্রগুপ্তির মত ‘শ্রুতি’ হিসাবেই ব্যবহৃত হতে থাকল। প্রাচীনকালের চিত্রিত শিলালিপি, চর্ম বা গাছের ছালে ও পাতায় লিখিত বিষয়গুলি 15 শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে নূতন করে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরমধ্যে 1453 তে ছাপাখানা আবিষ্কার একটি মহত্বপূর্ণ ঘটনা। এর আগে মানুষের চিন্তাধারাগুলিকে পাণ্ডুলিপির গর্ভ থেকে মুক্তি দেবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ছাপাখানার সাহায্যে মানুষদের চিন্তাধারাগুলিকে জনসাধারণের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা এক অভূতপূর্ব যুগারম্ভের সংকেত বহন করে।

তুলনাত্মক ভাবে দেখতে গেলে সেই সময় বা তার ও বহু আগে ভারতে লিপিব্যবস্থা - আজকে আমরা যাকে documentation বলি - তা সাধারণ আচরণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির জন্যই বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হত। তাই অথর্ববেদ বা তার পরবর্তী বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি ভারতে আবিষ্কৃত হলেও উপযুক্ত documentation এর অভাবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে এগুলিকে ভারতীয় মিস্টিসিজমের মধ্যেই রেখে দেওয়া হল। পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশীলার (700 BC)

পাঠক্রমে অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু থাকলেও শুধুমাত্র পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনীর মধ্য দিয়েই তার স্বীকৃতি। এর মধ্যে বিদেশের ছাত্র সম্প্রদায় এখান থেকে জ্ঞান অর্জন করে তাঁদের দেশে তা প্রচলিত ও বিকশিত করে সেইসব মতবাদ লিখিতভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করল। তুলনামূলক ভাবে ইউরোপের প্রথম পাঠশালা, প্লেটোর 'Academy' আমাদের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমসাময়িক (~ 400 BC)। Academy এর রচনাগুলি আজকে পৃথিবীর global ভাষায় অনূদিত, কিন্তু নালন্দার পাঠাগারের কোন পুঁথিরই প্রতিলিপি নেই। এই না থাকাটাই আমাদের স্তুতি ও মিস্টিসিজমের কবলে গ্রাসিত। এরই মধ্যে ইউরোপে Galen, Ptolemy, Leonardo da Vinci, Copernicus, Brahe, Kepler মনুষ্যকেন্দ্রিক বিষয়গুলি থেকে বেরিয়ে বিশ্বের অস্তিত্ব ও ইতিহাসের ব্যাখ্যার সূত্রপাত করে গেলেন। তাই ইউরোপে বিজ্ঞানের উদয়ের যুগে intellectual property right নিয়ে বাদানুবাদ সবই স্থান কাল পাত্র নিয়ে নিশ্চিত করার প্রথাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হল। ছাপাখানার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পত্রিকায় স্থান, কাল, পাত্রের সূচনা দিয়ে বিষয়গুলিকে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা আরো নিশ্চিত হল। কোন ব্যাখ্যার পরবর্তী সংযোজন বা সংশোধন কালের সঙ্গে পরিবর্তিত হলে তারও হিসাব থেকে যেতে লাগল। এই ভাবে অগ্রসর হওয়াতে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর পরিক্রমা, গ্যালেলিওর দর্শন ও তাঁর ঈশ্বর ভিত্তিক প্রাচীনতম dogma-র সাথে অসম লড়াই সবই ইতিহাস কিন্তু তারও বহু আগে ভারতে আর্য্যভট্টের সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর পরিক্রমা সংক্রান্ত দর্শন শুধুমাত্র documentation-এর অভাবে বিশ্ব স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত। এরকম অনেক আবিষ্কারের নজির দেওয়া সম্ভব কিন্তু ভারতীয় দর্শন, ঈশ্বরবাদ ও মিস্টিসিজমের বাহুল্যে এগুলির বেশীর ভাগই শ্রুতি হয়ে হারিয়ে গেছে। আধুনিক যুগে আমরা এই সকল বৈজ্ঞানিক ঘটনার ফলাফল নিয়ে শুধু বলতে পারি যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এগুলি সম্পর্কে অবগত ছিল কিন্তু প্রতিপাদ্যের সাক্ষর হিসাবে কোন লিপিবদ্ধ রূপ আমাদের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত থাকেনি। তাই বর্তমান বিশ্বে ভারতের বিজ্ঞান চর্চার শুরু ইউরোপের বিজ্ঞান চর্চার শুরু থেকে প্রায় 400 বছর পরে।

ভারতের রেনেসাঁর যুগপুরুষ রাজা রামমোহন রায় 1823 সালে প্রথম Scientific Western Education এর সমতুল্য শিক্ষার কথা বলেন। এর 46 বছর পরে Calcutta Journal of Medicine এ এক 36 বছরের যুবক মহেন্দ্রলাল সরকার এক জাতীয় বিজ্ঞানাগার গঠনের প্রস্তাব রাখেন। এক বছর পরে, 1870এ Hindu Patriotএ Indian Association for the Cultivation of Science (IACS) এর গঠনের সবিস্তারে বর্ণনা ও যুগ সন্ধিক্ষণে Father Lafonte এর সাথে তা সাকার করতে এক সাথে কাজ ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক মহত্বপূর্ণ ঘটনা। রেভারেন্ড ফাদার ল্যাফোঁ (Lafonte) বলেছিলেন যে মহেন্দ্রলাল ইউরোপীয়ানদের সুপিরিয়র হওয়ার কারণ যে বিজ্ঞান সেই বিচার ভারতীয়দের বোঝাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। 29th July, 1876এ 210 বৌবাজার স্ট্রীটে কলকাতার IACS এর বক্তৃতা কক্ষ প্রস্তুত হয়। এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যা হল, প্রথমে মৌলিক বিজ্ঞান এবং পরে সেগুলোর application বা practical art হিসাবে শিক্ষার ব্যবস্থা। ইউরোপের lecture demonstration এর মত IACS এর বক্তৃতামালার ব্যবস্থা এক নতুন যুগের সুচনা। সেই সময় কিছু বিজ্ঞানপিপাসু তরুণ, যেমন জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই রকম বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। 1893 সালে IACS এর বাৎসরিক সভায় মহেন্দ্রলাল বললেন যে ‘‘original research’’ই IACS-র মূল লক্ষ্য। Professor Huxley কে উদ্ধৃত করলেন,‘‘I weigh my words when I say that if the nation could purchase a potential Watt or Devy or Faraday at the cost of sterling pounds 100,000 down, he would be dirt-cheap at that money.’’ তিনি জোর দিয়ে বললেন যে বেশী fund পেলে applied বা technological science করা যেতে পারে কিন্তু প্রথম লক্ষ্য মৌলিক গবেষণা।

যে বাতাবরণে মানুষ চিন্তাশীল হয়ে বিজ্ঞান ব্রতী হতে পারে সেরকম আবহাওয়া তৈরী হলেও

টাকার অভাবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বিজ্ঞান ছেড়ে আইন ব্যবসায় যোগ দিতে হল। তরুণ জগদীশচন্দ্র বসু লর্ড রিপনের সংস্তুতিতে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ানোর দায়িত্ব পেলেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও প্রেসিডেন্সীতে পড়ানোর দায়িত্ব পেলেন। খালি পেটে বিজ্ঞান বা ধর্ম চর্চা কিছুই হয় না, তাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষুধা অনেকের থাকলেও টাকার অভাবে কোন কিছু যুগান্তকারী আবিষ্কার করাও সম্ভব ছিল না। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ভারতের বাইরে থেকে রসায়নে ডক্টরেট করেও বিজ্ঞানচর্চা করতে পারলেন না, নিজাম কলেজে অধ্যক্ষের চাকরী নিলেন। সরকারী এবং দেশের ধনী মানুষদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য না পেয়ে এই প্রতিষ্ঠান (IACS) কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলেও কোন Fellowship বা Professorship দেবার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রইল। এসময় মহেন্দ্রলাল মারা গেলেন কিন্তু তরুণ সি ভি রামনের জন্য IACS তৈরী করে দিয়ে গেলেন। মহেন্দ্রলালের অবর্তমানে IACS এর সেক্রেটারী অমৃতলাল সাদরে রামন কে IACS এর দরজা খুলে দিলেন। রামনের কলকাতায় পেটেন্ট অফিসের চাকরী অন্নচিন্তা থেকে তাঁকে আগেই মুক্তি দিয়েছিল। এবার মন দিয়ে তিনি বিজ্ঞান সাধনায় ব্রতী হলেন। জামসেদজী টাটা 1898 সালে 30 লাখ টাকা দিয়ে John - Hopkins University, Baltimore এর মত এক রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এর পরিকল্পনা করলেন। তিনি সরকারের কাছ থেকে সমপরিমাণ টাকার দাবী করলেন এবং তখনকার রাজাদের কাছেও দানের আবেদন করলেন। টাটার পরিকল্পনার সঙ্গে IACS এর পরিকল্পনায় প্রথম দৃশ্যত তফাৎ হল এই যে টাটার সংস্থায় বেশী টাকা দিয়ে বিদেশী অধ্যাপকদের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করার সুযোগ রইল আর IACS শুধুমাত্র ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের অন্নচিন্তা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতেও অক্ষম রইল। জগদীশচন্দ্রকে 1885 থেকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল ভাল ল্যাবরেটরীর জন্য এবং 1895 সালে তার প্রথম বৈজ্ঞানিক রচনা Journal of Asiatic society তে প্রকাশিত হল। প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রথম গবেষণালব্ধ ফলাফল ঐ Journal of Asiatic society তেই প্রকাশিত হল 1894 সালে। যন্ত্রপাতি তৈরী করার জন্য এক কামারকে জগদীশচন্দ্র নিজের হাতে কাজ শিখিয়েছিলেন এবং তার সাহায্যেই তাঁর নতুন যন্ত্রপাতি সম্বলিত

workshop তৈরী হয়েছিল। এরপর একান্ত একক প্রচেষ্টায় তিনি অত্যন্ত উচ্চমানের গবেষণার সাক্ষর রাখলেন বেতার জাতীয় গবেষণার ক্ষেত্রে। এই গবেষণালব্ধ প্রতিষ্ঠা তিনি অর্থকরী করতে চাননি। তাঁর magnetic material এর fatigueness বোঝাতে গিয়ে তিনি শুধু জড়বস্তুর সঙ্গে জীবন্ত বস্তুর তুলনা করে biologist দের বিদ্রূপ শুনেছিলেন। সেই কটাক্ষের জবাব দিতে তিনি হয়ে উঠলেন একজন অগ্রগণ্য biophysicist। আজ আমরা memory, smart molecule সবই কল্পনা থেকে বস্তুভিত্তিক করে নিয়েছি কিন্তু আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বহু আগে এগুলির মানে বুঝতে পেরেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ 1892 সালে ক্ষেত্রীর পন্ডিত শঙ্করলাল কে লেখা চিঠিতে বলেন যে ভারতীয় হিন্দু দর্শনে আমরা সবসময় চুলচেরা তর্ক বিতর্ক করে গেছি একটা ধারণাকে মেনে নিয়ে, কিন্তু সেই ধারণাটা কতটা নির্ভুল তা বিচার প্রায় কখনই করিনি। তিনি বললেন যে আগে দেখো সেটা কতটা ঠিক এবং তারপরে তার ব্যাখ্যা কর। স্বামীজী ইংল্যান্ডে বললেন যে ধর্মকে বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলতে হবে। যদি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ধর্ম ভেঙে পড়ে তবে তা ধর্ম নয় কুসংস্কার, সেটা যত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ে ততই মঙ্গল। আসল ধর্মের মন্ত্রগুলি physics বা chemistry এর সূত্রের মতই universal truth এর উপর দাঁড়িয়ে থাকবে।

এদিকে 1909 সালে প্রচুর আর্থিক সাহায্যে Prof. Ramsey এর সহকর্মী M. Travers Indian Institute of Science, Bangalore এর ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন। এই Institute জামসেদজী টাটার উদ্যোগে তাঁর, মাইসোরের রাজা ও ভারত সরকারের টাকায় তৈরী হয়। 1911 সালে প্রথম batch student এল general ও applied chemistry তে এবং পরে organic chemistry বিভাগও খোলা হল। IACS ও IISc-এর বিজ্ঞান গবেষণার মূল দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ এই ছিল যে IACS সম্পূর্ণ স্বদেশী এবং বৌদ্ধিক গবেষণা দিয়েই বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত করে আর IISc প্রথমেই বিলেত থেকে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নিয়ে ছাত্রদের

পড়াশোনার জন্য উদ্যোগী হল। এতে দৃশ্যত একটি pattern সেট হয়ে গেল, তাই Cambridge ও Oxford trained অনেক ভারতীয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এখানে বিজ্ঞান পড়ানোর জন্য আসেন। একথা জেনে রাখা ভালো যে এই Institute-এর প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর 1933 সালে Prof. Raman যিনি IACS এ কাজ করে মহেন্দ্রলালের স্বপ্নকে সাকার করেন এবং এর পরের ডিরেক্টর Sir. J.C.Ghosh, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র। এখানে প্রায় এক যুগ ডিরেক্টর হিসাবে থাকার পর ভারতের নতুন টেকনোলজিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থাতে যোগ দিতে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি IIT Kharagpur-এ প্রথম ডিরেক্টর পদ গ্রহণ করেন। IACS সত্যই ‘‘original research’’ এর জন্য খ্যাতি পেল। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সেই সময়ে এক দল তরুণ বিজ্ঞানীদের তৈরী করেছিলেন। সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের vice chancellor আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে post graduate শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করে দিলেন। স্যার আশুতোষ তাঁর নিজের জীবনে বিজ্ঞান চর্চা না করতে পারার দুঃখ ভোলেননি, তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে chair Professorship এর ব্যবস্থা করে রামন সহ সবাইকে বিজ্ঞান সাধনার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। অধুনা ভারতে বিজ্ঞান সাধনার এই যুগটিকে স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আবার বিলেত যেতে পারলেন না, তাই তিনিও এক নতুন বিজ্ঞানের সূত্রপাত করলেন। সেই সময় ইউরোপে Physical Science এর মৌলিক আবিষ্কারগুলি একের পর এক বেরোতে লাগল। এর মধ্যে মুস্কিল হল যে প্রায় বেশ কিছু মৌলিক গবেষণা German ও French ভাষাতে লেখা হচ্ছিল। তরুণ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা প্রতিদিন হিন্দু হস্টেলে ভোর চারটেই উঠে একঘন্টা German ও একঘন্টা French পড়া শুরু করে দিলেন এবং ততদিন এইরকম করে পড়লেন যতদিন না তাঁরা সে যুগের মৌলিক গবেষণাপত্রগুলি German ও French থেকে ইংরাজীতে translate করতে পারলেন। এই আগ্রহের অব্যবহিত ফল স্বরূপ তাদের কাছ থেকে বেরিয়ে এল কিছু মৌলিক গবেষণাপত্র যা পৃথিবীতে বিজ্ঞানের জগতে স্বকীয় গুরুত্ব ও মর্যাদায় আজও প্রতিষ্ঠিত। এদিকে

সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় Kumbakonam এর এক তরুণ, রামানুজম, গণিতে 1911 খৃষ্টাব্দে তাঁর original research paper পাবলিশ করলেন Journal of the Indian Mathematical Society তে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা না থাকার জন্য Madras University তে তাঁর পড়াশোনা হল না। কিন্তু Cambridge এর Professor Hardy -এর recommendationএ Madras University তাঁকে দু বছরের ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছিল। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে 1916 তে তিনি Cambridgeএ পড়াশোনা করতে পারলেন এবং 1918তে FRS ও পরে Trinity College -এর Fellowship অর্জন করলেন। ভাল খাদ্য ও সুচিকিৎসার অভাবে ভগ্নস্বাস্থ্য এই প্রতিভার অকালমৃত্যু হয় 1920 সালে, দেশে ফিরে। সেই সময়ই উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী অঙ্ক ও রসায়নের ছাত্র হয়েও 'কালা - আজার' নামক ব্যাধির ওষুধ (antimony এর এক organic যৌগ) আবিষ্কার করলেন। আবার গিরীন্দ্রশেখর বসু 1921 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে applied psychology তে ডক্টরেট পেয়ে psychoanalysis এর প্রচুর কাজ করেন এবং ভারতের প্রথম mental hospital এর প্রতিষ্ঠা 1940 এ নিজের ভাইয়ের (রাজকুমার বসু) বাড়ীতে শুরু করেন যা পরে Lumbini Park Mental Home এর আকার নেয়। বিশ্বের দরবারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার মত বিজ্ঞান মোটামুটি আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এতটাই করতে পেরেছিলাম। এখানে টাকার পরিমাণটা ভেবে দেখবার মত আর সমস্ত সুযোগ সুবিধা তাঁদের নিজেদেরকেই তৈরী করে নিতে হয়েছিল। সরকারী সাহায্য IACS তখন পায়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ও ভারতের স্বাধীনতার সময়কালে ভারতীয় বিজ্ঞানের সেরকম উল্লেখযোগ্য ঘটনা মনে পড়ে না। 1950 থেকে স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞানের রূপরেখা ঠিক করতে ভারত সরকার এগিয়ে এলেন। এখানে উদারপন্থী এবং বিদ্যোৎসাহী পন্ডিত নেহেরুকে এক সংঘাতের মধ্যে পড়তে হল। তিনি পড়লেন বিপদে, কারণ তখন বিজ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করতে অনেককেই পাওয়া গেল। মানসিকতার দিক দিয়ে এদের তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ, যাঁরা ভারতের

স্বাধীনতার সময় কষ্ট করে সম্পূর্ণ ভারতীয়তার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান সাধনা করার ফলে আর্থিক ও যন্ত্রাগারের অসুবিধার কথা অনুভব করেছিলেন। দ্বিতীয়ভাগে তাঁরা, যাঁরা বিলেতে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে কাজ করে আর্থিক ও যন্ত্রাগারের কোন অসুবিধা বোধ না করে দেশে ফিরেছিলেন আর তৃতীয় ভাগ যাঁরা ভাগ্য পরীক্ষার জন্য বিদেশে চলে গিয়েছিলেন এবং স্বাধীন ভারতে ফিরে এলেন ভাল কিছু পাবার আশায়। এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনই দেশের বিজ্ঞান পলিসিতে তাঁদের মতামত দিতে সক্ষম হলেন। দু ধরণের মতামত এই আলোচনা থেকে বেরিয়ে এল। এক : মৌলিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সংস্থায় হোক এবং applied গবেষণার জন্য কিছু ল্যাবরেটরী ও সংস্থা তৈরী হোক। দ্বিতীয় : বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সংস্থায় course work যুক্ত পড়াশোনা প্রধান কাজ হোক এবং সবপ্রকারের গবেষণা জাতীয় প্রয়োগশালায় হোক। যুদ্ধের পরে তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত ইউরোপ ও জাপানের দুর্দশা ও তাদের ঠিক করতে আমেরিকার অর্থবল ও সমস্ত মৌলিক চিন্তাধারায় যুক্ত বৈজ্ঞানিকদের সাশ্রয়ে এক নতুন ধরণের প্রফেশনের জন্ম দিল এবং তার নাম ‘manager’। আমরা scientist জানতাম, political scientist বুঝতাম, কিন্তু এখন এক নতুন ধরণের manager এসে গেলেন যাঁরা বিদেশে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করে দেশে ফিরে এসেই manager হয়ে বসলেন। এরা ভালভাবে আইডিয়া সেল করতে পারলেন। যাই হোক এঁদের সুপরামর্শে ভারত সরকার গবেষণা সংস্থান গুলিতেই সব টাকা invest করতে লাগলেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলি গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ থেকে বঞ্চিত ছিলই এবং নতুন করে সেগুলো কোন আর্থিক সাহায্য পেল না যাতে মৌলিক গবেষণা হতে পারে। এ এক democratic বিড়ম্বনা ! Excellent science - এর সাথে democracy কথাটা খাপ খায় না কারণ democratic excellence নামক শব্দগুলির কোন অর্থ হয় না। সেইজন্য হোমি ভাবা বাঁচার তাগিদে Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) নামক সংস্থাটিকে তৈরী করিয়ে নিলেন আর মেঘনাদ সাহা মনে করলেন যে সাংসদ হয়ে উনি মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণাকে বাঁচাবেন এবং তার আগেই তিনি Saha Institute of Nuclear Physics (SINP) তৈরী করে বিজ্ঞানকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন।

মৌলিক গবেষণা বাদ দিয়ে বিজ্ঞানকে ম্যানেজ করে নিজ স্বার্থে ব্যবহার এই সময় থেকেই ভারতীয় বিজ্ঞানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ল। কানাডার দেওয়া অপ্সরা reactor পাওয়া গেল কিন্তু কানাডার চুক্তি ছিল তাদের যেসব জাহাজগুলি জিনিষপত্র ভারতে পৌঁছে দিয়ে ফিরবে সেগুলি জলে ভাসার জন্য জল না ভরে মোনাজাইট বালি দিয়ে যেন ভরা হয়। সেইরকম ব্যবস্থা হল, কারণ আমাদের nuclear technology শিখতে হবে। জলের বদলে মোনাজাইট বালি কেন? প্রশ্নটা মেঘনাদ সাহার। তাই তিনি দুই বোরা ভর্তি এই বালি এনে কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজে তাঁর কলেজের সহপাঠী রসায়নবিদ পুলিনবিহারী সরকারকে অনুরোধ করলেন এর কারণ খোঁজার জন্য। অবধারিত ভাবে বালি থেকে বেরিয়ে এল নানা রকম ল্যান্থানাইডস্ এবং থোরিয়াম! Prof. Sarkar Dr. Bhatnagar কে তাঁর গবেষণার ফলাফল, Prof. Saha-র চিন্তার কথা সব জানালেন এবং বললেন যে আগামী Science Congress এ এই গবেষণা প্রবন্ধটি তিনি নিজে পন্ডিত নেহেরুকে পড়ে শোনাবেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসে S.S.Bhatnagar তাঁর welcome address-এই এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করলেন পন্ডিত নেহেরুর সামনে। যাঁরা বিষয়টি ভাবলেন, কাজ করলেন তাঁরা সুযোগই পেলেন না ব্যাপারটা সবার সামনে তুলে ধরতে। সস্তায় মোনাজাইট বালি পাঠানো বন্ধ হল। Bhatnagar পুলিনবিহারী সরকারকে বললেন যে, ‘আমি মনে করি আপনি জামসেদপুরে যে নতুন NML হয়েছে তার ডিরেক্টর পদ গ্রহণ করুন’। পুলিনবিহারী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন এই বলে যে বিজ্ঞান কলেজই তাঁর স্থান এবং stage manage করার মত কোন ইচ্ছেই তাঁর নেই। সৌভাগ্যক্রমে প্রফেসর পুলিনবিহারী সরকার আমার গবেষণা জীবনের প্রথম শিক্ষাগুরু এবং এই বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনাটি তাঁর মুখ থেকেই শোনা। এই রকম অনেক অলিখিত বিস্মৃত ঘটনা আছে যা বুঝতে সাহায্য করে যে মৌলিক গবেষণা থেকে আমরা পিছিয়ে গেলাম কেন।

Prof. Haldene একবার কটাক্ষ করেছিলেন ভুবনেশ্বরের CSIR এর এক ডিরেক্টরের research output দেখে। সেটা যেন সরকারী office order এর মত ছিল ঐ

ল্যবরেটরীতে, যে, সব বিভাগেই যে কোন বিষয়ের উপর লিখিত কোন গবেষণা প্রবন্ধে তারাযুক্ত author (অর্থাৎ principal author) হিসাবে ঐ ডিরেক্টরের নাম থাকবে । এভাবে তৈরী হল এক অদ্ভূত মানসিকতা, কে কত paper বড়কর্তাকে দিতে পারে। সংস্থার ডিরেক্টরের ডাকনাম হয়ে গেল 'boss'। ভাবতে পারা যায় যে Prof. Raman কে Dr. Krishnan ডাকছেন 'boss' বলে! এর সঙ্গে বিজ্ঞানকে promote করার জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন agency-এর মাধ্যমে কিছু কিছু বাৎসরিক পুরষ্কারের সৃষ্টি হল। প্রথম প্রথম বেশ সুষ্ঠভাবে তা হতে হতে শেষের দিকে ব্যাপারটা প্রায় ঐ 'boss' সম্প্রদায়ের ভিড়ে হারিয়ে গেল। গুপী গাইন বাঘা বাইন এর মত সব নতুন বিজ্ঞানীরা 'boss'দের বলে যাচ্ছেন, ''আপনাকে যদি একটু খুশী করতে পারতুম-----''। তাই দেখতে পাওয়া যাবে যে যার সঙ্গে জীবনে কখনো ঐ বিজ্ঞানের তেমন কোন যোগ নেই তবুও শুধু 60th, 70th birthday অথবা 63rd বা 68th birthday তেও paper dedicate করা হচ্ছে, লক্ষ্য - স্যার একটু দেখবেন। এখানে তুলনামূলক বিচারে দেখতে গেলে এক অ্যাথলিটকে খেলার ময়দানে perform করতে হয় লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে এবং অধুনা টিভিতেও তা দেখানো হয়। তাই দৌড়ের ক্ষেত্রে যার বুকে প্রথমে ফিতেটা স্পর্শ করে তাকেই জয়ী বলে ধরা হয়। কে গোল করল বা কে ক্রিকেটে সেঞ্চুরী করল সব transparent। কিন্তু বিজ্ঞানের সব পুরষ্কারের selection হয় রূদ্ধকক্ষে। Dr.Bhaba 1939 এ Ph.D করলেন Prof. Dirac এর কাছে এবং উনি 1941 এ F.R.S হয়ে গেলেন! Prof. S.N.Bose 1924 এ তাঁর যুগান্তকারী পেপার লিখেছিলেন - অতঃপর বোস-আইনস্টাইন মতবাদ, বোসন কণা ইত্যাদি । কিন্তু তিনি F.R.S হয়েছিলেন 1958 সালে! তাই সাহেব তোষণ এখনও রয়ে গেছে। Global অর্থ সংকটে বিদেশের বিজ্ঞানীরাও জানেন যে ভারতে বিজ্ঞান জগতে কে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং তাঁকে পুরষ্কার প্রদানে তাদের কি সুবিধা। ভারতের বিজ্ঞানে এইভাবে বিদেশী প্রভাব রয়েই গেছে। এইসমস্ত বিদেশী ও

দেশী পুরষ্কারে ভূষিত হয়ে একদল sublimed বৈজ্ঞানিক তৈরী হয়েছেন এবং এঁরাই এখন ভারতীয় বিজ্ঞানের ভাগ্যবিধাতা।

এরমধ্যে technological education এর জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরী বিদ্যা পড়ানো শুরু হয়ে গেল কয়েকটা I.I.T তে। গত প্রায় 50 বছর ধরে এই সব সংস্থা ভারতের সর্বোত্তম ছাত্রদের বেছে নিয়ে পড়িয়ে বিশ্বে নাম করেছে। এদের বেশীরভাগই সফলতম ম্যানেজার হয়েছেন এবং information technolgy তে নাম করেছেন। কিন্তু সব মিলিয়ে বৌদ্ধিক ও মৌলিক গবেষণা প্রায় কিছুই হয়নি। স্বাধীনতার পূর্বে স্বদেশী বিজ্ঞানীদের মন্ত্র ছিল, ভারতীয়রাও যে বিশ্বমানের বিজ্ঞান গবেষণা করতে পারে তা প্রমাণিত করা। স্বাধীনতার পর প্রযুক্তির প্রয়োগের জন্য প্রায় সবাই ঝুঁকে পড়ল টেকনোলজির দিকে। প্রথম দিকে ধার করা প্রযুক্তি নিয়ে জার্মানী, জাপান বাঁচবার রাস্তা পেয়ে পরবর্তী কালে স্বকীয় মর্যাদায় নিজেদের মৌলিক গবেষণা লব্ধ ফসল পুরানো প্রযুক্তিতে নিযুক্ত করে নতুন থেকে নতুনতর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্ম দিতে লাগল। সাউথ কোরিয়া, সিঙ্গাপুরও পরে শুধুমাত্র ধার করা প্রযুক্তি নিয়ে শুরু করে জার্মানী, জাপানের পথ ধরল। আমরা নিজস্ব টেকনোলজি উদ্ভাবনে অসমর্থ হয়ে পরিশেষে আউটসোর্সিং এর কিছু জিনিস পেয়ে সন্তুষ্ট রইলাম।তাই আজ M.Sc. পড়লে কোন চাকরী নেই কিন্তু computer application এ ডিপ্লোমা করলে B.P.O. তে 15,000 টাকা মাইনে পাওয়া যায়। খুব ভাল করে M.Sc. পড়লে ও NET পরীক্ষা দিয়ে সফল হলে 8000 টাকার research fellowship পাওয়া যায় কয়েক বছরের জন্য এবং তার পর কি হবে তা জানা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই, উপযুক্ত গবেষণাগার নেই। আপামর মানুষজন ‘boss’ দের দিকে তাকিয়ে আছেন কখন তারা কিছু পাইয়ে দেবেন।

1950 থেকে প্রায় 1970 পর্যন্ত কিছু ব্যক্তিবিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে মৌলিক বিজ্ঞানচর্চা করে গেলেন। এঁদের মধ্যে মাদ্রাজের রামচন্দ্রন ও তাঁর ছাত্র শশীশেখরন, কলকাতার প্রিয়দারঞ্জন রায় বা Sir

J.C.Ghosh। এঁদের আবিষ্কার, যা অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত ছিল সেগুলি পৃথিবীর পাঠ্যপুস্তকে পাঠ্যবস্তু হয়ে রইল। কৌলিন্যর বিচারে আমাদের বিজ্ঞানকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি, যেমন বিজ্ঞান এক শব্দে, উদাহরণ হল 'Raman', 'Boson'। এরপর কয়েক শব্দে, যেমন 'Saha Equation', 'Bardhan - Sengupta Phenanthrene Synthesis', 'Ray - Dutt Twist' বা 'Ramachandran Plot'। এগুলি সবই পাঠ্য পুস্তকে আছে এবং থাকবেও। এরপর তৃতীয় শ্রেণীতে ভারতের বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে থাকেনা অথচ বৈজ্ঞানিকের বায়োডাটাতে পাতার পর পাতা লেখা থাকে। এই তৃতীয় শ্রেণীর গবেষণার চল ভারতে প্রভূত। ব্যাপারটি বিশদে ব্যাখ্যা করে বললে আনেকটা এইরকম দাঁড়ায়। ধরা যাক বিদেশের কোন বিজ্ঞানী এক নতুন মতবাদ দুটি উদাহরণ দিয়ে প্রকাশ করলেন। এবার ভারতীয় বিজ্ঞানী সঙ্গে সঙ্গে আরো চারটি উদাহরণ দিয়ে গবেষণাপত্র লিখলেন এবং দাবী করলেন যে মতবাদটি ঠিক। এরকম গবেষণাপত্র ছাপাতে কোন অসুবিধা হয়না কারণ সম্পাদক প্রথমেই সেই প্রথম বৈজ্ঞানিককে এই রচনাটির ভালমন্দ বিচার করতে বলেন। পৃথিবীতে খুব কম লোকই আছে যিনি তাঁর নিজের কাজ অন্য লোক সমর্থন করে পেপার ছাপতে চাইলে তাঁকে বঞ্চিত করবেন। এই ধরণের বিজ্ঞান repetitive এবং আমরা তাই করে আসছি। যে থিয়োরী 1951 তে প্রথম দুটি molecule-এর গুণ দেখিয়ে প্রমাণিত হল সেটি আজও আমরা লক্ষ লক্ষ molecule তৈরী করে প্রমাণিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। বিদেশী বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় এগুলো হয়তো আর ছাপাতে চায় না কিন্তু অনেক ভারতীয় পত্রিকা আছে এবং এগুলোর editorial board এ manager-রাই থাকেন যারা খুবই ব্যস্ত এবং নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তা করার সময় এঁদের হাতে খুবই কম। Innovative গবেষণা যা কৌলিন্যের বিচারে প্রথম দুটির পর্যায়ে পড়ে তা করতে গেলে তপস্যার মত involve হতে হয়। পয়সার দরকার, peer review দরকার। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষদেরই imagination থাকেনা তাই তারা কোন প্রজেক্টের 90 শতাংশ ভালো দিকটা না দেখে 10 শতাংশ খারাপ দিকটা দেখে সেইমত বিচার করেই প্রজেক্টটি ফেরত পাঠিয়ে দেন। যুগান্তকারী প্রজেক্ট মানেই সাধারণত existing dogma-কে challenge, তাই এই democracy

তে কেউ Galelio হবার সুযোগ পায় না। প্রথমত, ‘‘আপেল নিচে পড়ে কেন!’’ আর ‘‘ সমুদ্রের জল নীল কেন!’’ - এই ধরণের প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রায় সব বেরিয়ে গেছে। এখন বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে অর্থের প্রয়োজন প্রচুর তাই বেশীর ভাগ কমিটির লোকেরাই existing paradigm এর বাইরে যেতে নারাজ। Democracy তে excellence বলে কোন কথা নেই। আমেরিকা, ইউরোপ, এমনকি কোরিয়া, চায়না, সিঙ্গাপুর আমাদের M.Sc. পাশ ছাত্রদের চাইছে। Ph.D. এর Fellowship কত? সবদেশেই প্রায় 1000 - 1500 US $ এর মতন। শুধু সাউথইস্ট এশিয়ার কয়েকটি দেশের মধ্যমণি ভারতে Ph.D.করতে 200 US$ থেকে কম দেওয়া হয়। কেন ভাল ছেলে মেয়েরা বিজ্ঞান পড়বে ? প্রয়োজনীয় কোন কিছুই তো নেই, তাই তারা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা বিদেশে গিয়ে মন দিয়ে কাজ করে যুগান্তকারী সব আবিষ্কার করছে।

আমার এ রচনা সাধারণভাবে ভারতে মৌলিক গবেষণাকে কেন্দ্র করে। আজ যা বিজ্ঞান, কাল তা টেকনোলজি। আমরা এখন টেকনোলজি ধার করছি কারণ এটা একটু পুরানো হয়ে outsource হিসাবে ভালই রুজির ব্যবস্থা করছে। বিশাল বড় দেশ, তাই ইকোনমি সামলে যাচ্ছে। প্রতি বছর হাজার হাজার তরুণ প্রতিভা বাইরে চলে গেলেও দুঃখ প্রকাশ করিনা, কারণ এদের কিছু দেবার ক্ষমতা থাকলেও আজও আমরা তার উপায় করে উঠতে পারিনি।

----------o----------

Dr. Sabyasachi Sarkar
Professor of Chemistry,
Indian Institute of Technology, Kanpur-208016
Tel: 0091-512-2597265 /2596409 /2597386(lab.)
Tel: 0091-512-2591211 /2598623 (residence)
mobile: 9839062156
alternate e-mail: protozyme@gmail.com